بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ মার্চ, ২০২৩ মোতাবেক ১৭ আমান, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পবিত্র কুরআনের মাকাম, মর্যাদা ও সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে ধর্মের মর্যাদা কী এবং মানবীয় শক্তিবৃত্তির ওপর এর কী প্রভাব রয়েছে এবং হওয়া উচিত; এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"মানবীয় শক্তিবৃত্তির ওপর ধর্মের কী প্রভাব রয়েছে, ইঞ্জিল এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি, কেননা ইঞ্জিল প্রজ্ঞার রীতিনীতি থেকে দূরে, কিন্তু পবিত্র কুরআন সবিস্তারে বার বার এ বিষয়টির সমাধান তুলে ধরে যে, মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তিকে পরিবর্তন করা আর নেকড়েকে ছাগল বানিয়ে দেখানো– এটি ধর্মের উদ্দেশ্য নয়।" অর্থাৎ শক্তিমানকে একেবারেই দুর্বল করে দেখানো। **"বরং ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো, যেসব শক্তিসামর্থ্য প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মাঝে নিহিত রয়েছে",** যেসব কর্মক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে; যা আল্লাহ্ তা'লা তাকে দিয়েছেন **"সেগুলোকে সঠিক সময়ে ও সঠিক স্থানে কাজে লাগানোর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া। কোনো প্রকৃতিগত শক্তিকে পরিবর্তন করার অধিকার ধর্মের নেই। তবে সেটিকে যথাযথ স্থানে ব্যবহার করার নির্দেশনা প্রদানের অধিকার রয়েছে আর কেবল একটি শক্তি, অর্থাৎ দয়া ও ক্ষমার ওপর যেন তা জোর না দেয়, বরং সকল শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য যেন নির্দেশ দেয়।"** এটি যেন না বলে যে, শুধু দয়া করো, ক্ষমা করো, বরং প্রয়োজন সাপেক্ষে সেই অবস্থার নিরিখে যে বস্তুর প্রয়োজন তা ব্যবহার করার প্রতি গুরুত্বারোপ যেন করে। মূল উদ্দেশ্য হলো সংশোধন ও উন্নতি আর এ লক্ষ্য যেভাবে পূর্ণ হতে পারে সেভাবেই তা করার চেষ্টা করা উচিত। "কেননা মানবীয় শক্তিবৃত্তির মাঝে কোনো শক্তিই মন্দ নয়, বরং এর অতিরিক্ত ও অপ্রতূল ব্যবহার এবং অপব্যবহার (হলো) মন্দ। আর যে ব্যক্তি তিরস্কারের যোগ্য সে শুধুমাত্র প্রকৃতিগত শক্তিবৃত্তির কারণেই তিরস্কারের যোগ্য নয়, বরং এর অপব্যবহারের কারণে নিন্দনীয়। এর একটি ছোট্ট উদাহরণ হলো, দৈহিকভাবে শক্তিশালী একজন মানুষ যদি নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকে অথবা ক্ষমতাবান হওয়ায় অত্যাচার করতে থাকে, অন্যদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত না হয়, যথাস্থানে নিজ শক্তিরবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ না ঘটায়, বরং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং দাপট দেখানোই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এমন ব্যক্তি মন্দ আখ্যায়িত হবে।" তার শক্তিসামর্থ্যগুলো মন্দ নয় বরং সেগুলোর ব্যবহার মন্দ। তার কর্ম মন্দ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কুরআনের সত্যতা প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করা–এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"মুসলমানরা কুরআনকে একেবারেই বুঝে না– একথা আসলেই সত্য। কিন্তু কুরআনের সঠিক মর্মার্থ প্রকাশ করাই এখন খোদার অভিপ্রায়। খোদা আমাকে এজন্যই প্রত্যাদিষ্ট করেছেন আর আমি তাঁর ওহী ও এলহামের আলোকে পবিত্র কুরআন অনুধাবন করি। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এমন যার ওপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না।

এছাড়া যৌক্তিক বিষয়াদিতে তা এতটাই সমৃদ্ধ যে, একজন দার্শনিকও আপত্তির সুযোগ পায় না।"

এরপর কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) জামা'তকে উপদেশ দিয়েছেন যে, **পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীরভাবে অভিনিবেশ করো, এতে সবকিছুই রয়েছে। (এতে) সকল পুণ্য ও মন্দকর্মের বিশদ বিবরণ রয়েছে এবং ভবিষ্যতের সংবাদ ইত্যাদিও বিদ্যমান। ভালোভাবে জেনে রাখো! এটি সেই ধর্ম উপস্থাপন করে যার প্রতি কোনো আপত্তি হতে পারে না, কেননা প্রয়োজনে সকল যুগে এর সতেজ কল্যাণরাজি ও ফলফলাদি সতেজ হয়। ইঞ্জিলে ধর্মকে পরিপূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হয়নি। এর শিক্ষা সেই যুগের অবস্থাসম্মত হয়ত হবে কিন্তু তা আদৌ সকল যুগ এবং সর্বাবস্থার জন্য নয়।** [যে যুগে হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন (ইঞ্জিল) সেই যুগের অবস্থা অনুযায়ী ছিল, কিন্তু এযুগের জন্য নয়।] **এই গৌরব কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনেরই যে, আল্লাহ্ তা'লা এতে সকল ব্যাধির চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন এবং সকল শক্তিবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করেছেন। এছাড়া যেসব মন্দকর্মের উল্লেখ করেছেন তা দূর করার রীতিও বর্ণনা করেছেন। তাই পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকো এবং দোয়া করতে থাকো আর নিজের আচারআচরণকে এর শিক্ষাসম্মত রাখার চেষ্টা করো।**

পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, **কুপ্রথা ও বিদাত পরিহার করা উত্তম। এর ফলে ধীরে ধীরে শরীয়তে হস্তক্ষেপ আরম্ভ হয়ে যায়। তাই উত্তম পন্থা হলো, এমন ওযিফার পেছনে যে সময় ব্যয় করার থাকে তা পবিত্র কুরআনে অভিনিবেশের পেছনে ব্যয় করো।** [মানুষ লেখে যে, কোনো ওযিফা বা ছোট একটি বাক্য বলে দিন যাতে আমরা এর পেছনেই সময় ব্যয় করতে পারি। তিনি (আ.) বলেন, না; পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীর অভিনিবেশে সময় ব্যয় করো। কিছু লোক কোনো কোনো ওযিফা পড়ার পেছনেই সময় ব্যয় করতে থাকে। যেসব ওযিফা ও যিকর করে তার কোনো অর্থও তাদের অনেকে জানে না অথচ মনে করে, এটিই তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম।] **তিনি (আ.) বলেন, এর পরিবর্তে এ সময় পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ ও প্রনিধানে ব্যয় করলে তা-ই হবে অধিক উত্তম। এর মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করতে পারবে।** (অ-আহমদী মুসলমানদের মাঝে এভাবে অনেক ধরনের বিদাতের প্রচলন হয়েছে, কিন্তু কোনো কোনো আহমদীও এর দ্বারা প্রভাবিত; তাই এ থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত এবং পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং তফসীর পড়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া উচিত। আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার অথবা কোথাও কোথাও বুধবার থেকে রমজান শুরু হতে যাচ্ছে, তাই এ রমজানে আমাদের বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন পড়া, পড়ানো এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করা উচিত।]

তিনি (আ.) বলেন, **হৃদয়ে কঠোরতা থাকলে তা কোমল করার একমাত্র পদ্ধতি হলো, পবিত্র কুরআন বারংবার পড়া। যেখানে যেখানে দোয়ার উল্লেখ থাকে সেখানে মু'মিনের হৃদয়ও চায়, এই ঐশী কৃপা যেন আমিও প্রাপ্ত হই। পবিত্র কুরআনের উদাহরণ একটি বাগানের ন্যায়, একস্থান থেকে (মানুষ) এক ধরনের ফুল তোলে, এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে আরেক ধরনের ফুল তোলে। অতএব প্রত্যেকে স্থান থেকে অবস্থা অনুযায়ী লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।** তিনি (আ.) বলেন, **মানুষ যেন আদেশ-নিষেধকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে। এর ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।** [অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা (যেন মানুষ) পালন করে এবং যেসব বিষয় বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা

করে। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখুন। এগুলোই ফুল যা এই বাগান থেকে মানুষ তুলে নেয়।] তিনি (আ.) বলেন, **কেউ কেউ তো এতটা সীমা ছাড়িয়েছে যে, নিজেদের জ্ঞানের বড়াই করে পবিত্র কুরআনের কতিপয় সূরা সম্পর্কে (কেউ কেউ) বলে, অমুক পদ্ধতিতে পাঠ করলে কল্যাণ পাবে নতুবা পাবে না [দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি (আ.) সূরা ইয়াসীনের উদাহরণ দিয়েছেন]। এ ধরনের কথা বলা তো খোদা হবার দাবি।** অতএব এমন বিষয়াদি থেকে আমাদের বিশেষভাবে বিরত থাকা উচিত।

কুরআনের প্রতি বিমুখতা দু'ভাবে প্রদর্শিত হতে পারে। একটি হলো, আক্ষরিক অর্থে বিমুখতা এবং দ্বিতীয়ত অর্থগত বিমুখতা; আর এর অর্থ কী? বিমুখতা অর্থ হলো, এর শিক্ষা পালন না করা। হয় আক্ষরিক অর্থে মানুষ তা পালন করে না অথবা অর্থগতভাবে পালন করে না। এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, **পবিত্র কুরআনের প্রতি বিমুখতা দুভাবে হয়ে থাকে। একটি আক্ষরিক বা বাহ্যিক (বিমুখতা) এবং অপরটি অর্থগত (বিমুখতা)। আক্ষরিক বা বাহ্যিক অবস্থা হলো, খোদার বাণী কুরআন কখনো না পড়া। যেভাবে অধিকাংশ লোক মুসলমান অভিহিত হলেও পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্পর্কেও তারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। আর দ্বিতীয় দিকটি হলো অর্থগত। অর্থাৎ তিলাওয়াত করলেও এর কল্যাণ ও জ্যোতি এবং রহমতের প্রতি মানুষের ঈমান থাকে না। অতএব এই উভয় বিমুখতার মধ্য থেকে কোনো একটি বিমুখতা থাকলে তা থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, ইমাম জাফরের উক্তি রয়েছে, আল্লাহ্ই ভালো জানেন তা কতটা সঠিক, (আর সেটি) হলো, আমি এত বেশি (আল্লাহ্র) বাণী কুরআন পাঠ করি যে, তখনই এলহাম হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি একথা বলেছেন কি বলেন নি তা জানা নেই, কিন্তু কথা যুক্তিসঙ্গত। কেননা এক প্রকার বস্তু অপর বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। বর্তমান যুগে মানুষ শত শত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ টীকাপাদটীকা যোগ করে রেখেছে। শিয়ারা পৃথক, সুন্নিরা পৃথক (ব্যাখ্যা করে)। তিনি (আ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার এক শিয়া আমার পিতাকে বলে, আমি একটি বাক্য বলে দিচ্ছি, সেটি পড়ে নিলে (বাহ্যিক) পবিত্রতা এবং ওজু ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন হবে না। শুধু সেই বাক্যটিই আপনার জন্য যথেষ্ট। সেটিই ওজু এবং পরিচ্ছন্নতা (বলে গন্য) হবে। তিনি (আ.) বলেন, ইসলামে কুফর, বিদাত, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা ইত্যাদির অনুপ্রবেশ এভাবেই ঘটেছে। যেমন এক ব্যক্তি বিশেষের কথাকে এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেমনটি খোদার কালাম কুরআনকে দেয়া উচিত ছিল। এজন্যই সাহাবীরা হাদীসকে কুরআনের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের জ্ঞান করতেন। তিনি (আ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত উমর (রা.) কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে বলে, হাদীসে এটি লেখা আছে। অর্থাৎ একথা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপিত। এটিও মনে রাখা উচিত যে, হাদীস যদিও অনেক পরে একত্র করা হয়েছে তথাপি কখনো কখনো কোনো কোনো সাহাবী সেগুলো লিখেও রাখতেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, এক বৃদ্ধার জন্য আমি আল্লাহ্র কিতাবকে পরিত্যাগ করতে পারি না। এই রেওয়ায়েতটি এক মহিলার, সে একথা বলছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কালাম এর বিপরীত। আল্লাহ্ তা'লার কালাম যা বলে সেটিই প্রকৃত সত্য। অতএব এটিই সত্য আর একেই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। তা না হলে বিদাত ছড়াতে থাকবে আর এ কারণেই মুসলমানদের মাঝে বিদাত বিস্তার লাভ করছে আর পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে (মানুষকে) দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অধিকাংশ মুসলমানের মাঝেই এসব বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়, যেমনটি এখনই আমি উদাহরণ দিয়েছি যে, হযরত মসীহ্**

মওউদ (আ.) বলেছেন, এক শিয়া আলেমের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতাকে এটি বলা যে, একটি বাক্য মাত্র, সেটি পড়ে নিবেন তাহলে ওজুরও প্রয়োজন নেই আর পবিত্রতারও প্রয়োজন নেই। সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশই অজ্ঞ। নামধারী আলেমরা তাদেরকে যেদিকে নিয়ে যায় তারা সেদিকেই ছুটে আর (এভাবে) বিদাত বিস্তার লাভ করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে করা হয় যে, আমরা নাকি পবিত্র কুরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করি!

মুসলমানদের উন্নতি পবিত্র কুরআনের সাথে শর্তযুক্ত– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসারী ও পালনকারী না হবে তারা কোনো প্রকার উন্নতি করতে পারবে না। পবিত্র কুরআন থেকে তারা যতটা দূরে সরে যাচ্ছে উন্নতির বিভিন্ন স্তর ও পথ থেকেও তারা ততটাই দূরে সরে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনের অনুসরণই উন্নতি ও হেদায়েতের কারণ। আল্লাহ্ তা'লা ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিকাজ ও জীবিকা উপার্জনের বিভিন্ন হালাল পন্থা অবলম্বনে বারণ করেন নি। তবে হ্যাঁ, সেটিকেই মূল লক্ষ্য বানানো উচিত নয়, বরং সেটিকে ধর্মের সেবক হিসেবে রাখা উচিত। সম্পদ ধর্মের সেবক হবে– এটিই যাকাতের উদ্দেশ্য।

অতএব একজন মু'মিনের নিজ জীবনের লক্ষ্য শুধু পার্থিব আয়-উপার্জন নির্ধারণ করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃত ইবাদতকারী হিসেবে জীবন কাটানো, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা– সেটির সন্ধানই আমাদের করা উচিত। যাকাত ও খোদা তা'লার পথে ব্যয় করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যেন সম্পদ শুধু নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য না হয়, বরং তা ধর্মের উন্নতি, আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার আদায়ের জন্যও ব্যয় করা হয়। তিনি বলেন,

কুরআন মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার আর মানুষ এ সম্পর্কে অনবহিত। তিনি বলেন, পরিতাপের বিষয় হলো মানুষ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও তৎপরতার সাথে পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ করে না। এক জগৎপূজারী স্বীয় জগতপূজা বা একজন কবি নিজ কবিতার প্রতি যতটা অভিনিবেশ করে কুরআন শরীফের প্রতি ততটা অভিনিবেশও করা হয় না। তিনি বলেন, বাটালায় একজন কবি ছিল। তার একটি কবিতার বই আছে। সে একটি পঙক্তি লিখে, এটি একটি ফারসী পংক্তি,

صباشرمندہ می گردد بروئے گل نگاہ کردن

অর্থাৎ পূবালী বায়ু ফুলের চেহারায় দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পঙক্তির সন্ধানে সে পুরো ছয় মাস হাবুডুবু খেতে থাকে। খুঁজতে থাকে ও ভাবতে থাকে। পরিশেষে একদিন এক কাপড় বিক্রেতার দোকানে সে কাপড় কিনতে যায়। বস্ত্র বিক্রেতা বেশ কিছু কাপড়ের থান বের করে কিন্তু তার কোনোটিই পছন্দ হয়নি। অবশেষে কোনোকিছু ক্রয় না করেই সে যখন ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায় তখন কাপড় বিক্রেতা দোকানদার অসন্তুষ্ট হয় যে, তুমি এতগুলো থান খুলিয়েছো আর অযথা কষ্ট দিয়েছো। এতে সে দ্বিতীয় পঙক্তি পেয়ে যায় এবং নিজের পঙক্তি সে এভাবে পূর্ণ করে যে,

صباشرمندہ می گردد بروئے گل نگاہ کردن

کہ رخت غنچہ راوا کردو نتوانست طے کردن

অর্থাৎ পূবালী বায়ু ফুলের চেহারার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত হয় যে, সে ফুলকলির আবরণকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে কিন্তু সেটিকে একত্রিত করতে পারেনি। তিনি বলেন, সেই কবি একটি পঙক্তির জন্য যতটা পরিশ্রম করেছে এখন মানুষ পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত বুঝার জন্যও ততটা পরিশ্রম করে না। তিনি বলেন, কুরআন মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার কিন্তু মানুষ সে সম্পর্কে উদাসীন।

এরপর তিনি বলেন, কুরআন শরীফে যে পরিমাণ গুঢ় রহস্য ও গভীর বিষয়াদি রয়েছে তওরাত ও ইঞ্জিলে তা কোথায়? এছাড়া কুরআন শরীফ সমস্ত বিষয় শুধু দাবির আকারেই বর্ণনা করে না যেমনটি তওরাত ও ইঞ্জীল কেবল দাবির পর দাবি করে থাকে, বরং কুরআন শরীফ প্রমাণিক বৈশিষ্ট্য রাখে, প্রমাণ উপস্থাপন করে। তা এরূপ কোনো বিষয় বর্ণনা করে না যার সাথে একটি শক্তিশালী ও দৃঢ় দলিল উপস্থাপন করেনি। কুরআন শরীফের বাগ্মিতা ও ভাষার অলংকার যেভাবে নিজের মাঝে এক আকর্ষণ রাখে, এর শিক্ষার মাঝে যেরূপ গ্রহণযোগ্যতা ও আকর্ষণ রয়েছে, তেমনই এর প্রমাণগুলোও প্রভাব বিস্তারী। সুতরাং অন্য কোনো গ্রন্থ কুরআন করীমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এছাড়া তিনি এটিও বলেছেন যে, যেভাবে কুরআন করীম সকল কিতাবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেভাবেই মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাও সব নবীর চাইতে বড়। অতএব যখন কুরআন পড়বে এবং এতে কোনো বিষয় দেখবে তখন সেখানেই এর প্রমাণও সন্ধান করো।

কোনো যাদুও পবিত্র কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে না- এই শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত, আমরা এমন কুরআন শরীফ উপস্থাপন করি যার ভয়ে যাদু পলায়ন করে। এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো মিথ্যা ও যাদু দাঁড়াতেই পারে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের হাতে এমন কী আছে যা নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়? নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, পবিত্র কুরআন সেই মহান অস্ত্র যার সামনে কোনো মিথ্যার দাঁড়িয়ে থাকার সাহসই নেই। এ কারণেই মিথ্যার পূজারী আমাদের সামনে, আমাদের জামা'তের সামনে দাঁড়ায় না এবং আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এটি স্বর্গীয় অস্ত্র যা কখনো ভোঁতা হতে পারে না।

অতএব, এ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরা যেন পবিত্র কুরআনে গভীর অভিনিবেশ ও প্রণিধানের প্রতি অধিক মনোযোগী হই যাতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত অবস্থাও উন্নত করি এবং বিরুদ্ধবাদীদের (আপত্তির) খণ্ডনও করতে পারি।

পবিত্র কুরআনের অনুসরণে (অর্থাৎ কুরআন করিমের পূর্ণ আনুগত্য করা হলে) খোদা তা'লা লাভ হয়- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের রসূল কেবল একজনই এবং এই রসূলের প্রতি একমাত্র এই কুরআন শরীফই অবতীর্ণ হয়েছে যার অনুসরণে আমরা খোদাকে লাভ করতে পারি। আজকাল পির-ফকিরের উদ্ভাবিত পন্থাসমূহ এবং গদিনশিনদের সাইফি তথা জপ-তপ (মন্ত্র বা অজিফাকে সাইফি বলে যা কারো ক্ষতিসাধনের জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত একাধারে পড়া হয়) মন্ত্র-তন্ত্র বা দোয়া এবং দরূদ ও অজিফা- এসব মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। অতএব তোমরা এগুলো পরিহার করে চলো। এরা মহানবী (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়া হওয়ার মোহরকে ভাঙতে চেয়েছে। বলতে গেলে তারা নিজেদের জন্য পৃথক এক শরীয়তই বানিয়ে নিয়েছে। তোমরা স্মরণ রেখো, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনার অনুবর্তিতা এবং নামায-রোযা

প্রভৃতি মাসনুন পন্থা (তথা সুন্নতী ব্যবস্থাপত্র) রয়েছে এগুলো ছাড়া খোদার কৃপা ও কল্যাণরাজির পথ উন্মুক্ত করার আর কোনো চাবিই নেই। সেই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট যে এসব পথকে পরিত্যাগ করে অন্য কোনো পন্থার উদ্ভাবন করে বা অবলম্বন করে। সে ব্যর্থ মরবে যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল নির্দেশিত পথের অনুবর্তী না হয়ে অন্য পথ ও পন্থায় তা অন্বেষণ করে।

পবিত্র কুরআনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য তিনি এটি বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন প্রত্যেক জাতির নবীর প্রতি ঈমান আনাকে আবশ্যক ঘোষণা দিয়েছে। যেমন তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআন সেই সম্মানযোগ্য গ্রন্থ যা জাতিসমূহের মাঝে মিমাংসার ভীত রচনা করেছে এবং প্রত্যেক জাতির নবীকে স্বীকৃতি দিয়েছে আর সারা বিশ্বে এই গৌরব বিশেষভাবে কেবল পবিত্র কুরআনেরই যে কুরআন বিশ্বের নবীদের সম্পর্কে আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ অর্থাৎ হে মুসলমানরা! তোমরা বলো, আমরা সারা বিশ্বের সব নবীর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাদের মাঝে এমন কোনো বিভেদ করি না যে, কতিপয়কে স্বীকার করব আবার কতিপয়কে প্রত্যাখ্যান করব। তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, যদি এমন কোনো শান্তিপূর্ণ গ্রন্থ থেকে থাকে তাহলে তার নাম উপস্থাপন করো।

পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্যের মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য হলো, পবিত্র কুরআনে বাহ্যিক ধারাবিন্যাস বজায় রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআন বাহ্যিক ক্রমবিন্যাসকে নিপুণভাবে বজায় রেখেছে। পবিত্র কুরআনের বাগ্মিতার একটি বড় অংশ এরই সাথে সম্পৃক্ত। এর কারণ হলো, ক্রমবিন্যাস ঠিক রাখাও বাগ্মিতার অংশ, বরং উন্নত বাকশৈলী এটিই যাতে গভীর প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত থাকে। যে ব্যক্তির কথায় বা বচনে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না বা থাকলেও কম থাকে এমন ব্যক্তিকে আমরা কখনো বাগ্মী ও সুবক্তা বলতে পারি না। অর্থাৎ, সে-ই বাগ্মী যার বর্ণিত বিষয় স্থানকালের দাবি অনুসারে হয়ে থাকে এবং বিষয়টির সকল দিক ও আঙ্গিক পুরোপুরি আয়ত্ব করা হয় আর ফসীহ বা প্রাঞ্জল হয়ে থাকে অর্থাৎ এমন সুন্দর বাক্যমালা ব্যবহৃত হওয়া চাই যা সুন্দর অর্থও প্রদান করবে এবং বাক্যের ক্রমবিন্যাসও তাতে বজায় থাকবে। তিনি (আ.) বলেন, এমন ব্যক্তিকে আমরা কখনোই বাগ্মী ও সুবক্তা বলতে পারি না, বরং কোনো ব্যক্তি যদি বাক্যবিন্যাসের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতা দেখায় তবে এরূপ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে উন্মাদ ও পাগল। কেননা যার বক্তৃতা গোছালো নয়, তার হুঁশ-জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গুলো অকেজো। (যদি কথা গোছালো না হয়, সেগুলোতে যদি বিন্যাস ও বন্ধন না থাকে, তবে এর অর্থ হলো সেই ব্যক্তি পাগল, উন্মাদ) সেক্ষেত্রে খোদার সেই পবিত্র বাণী যা বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার দাবি করে সকল প্রকার সত্যের প্রতি আহ্বান জানায়, এরূপ নিদর্শনমূলক বাণীর মাঝে প্রাঞ্জলতার এই আবশ্যকীয় গুণের ঘাটতি থাকবে এবং তা সুবিন্যস্ত হবে না– এটি কীভাবে সম্ভব?

অতএব পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং বাকশৈলী ও প্রাঞ্জলতায় সমৃদ্ধ। এটি সম্ভবই নয় যে, এর মাঝে বাক্যবিন্যাস থাকবে না, যেমনটি কতিপয় আপত্তিকারী আপত্তি উত্থাপন করে থাকে।

পবিত্র কুরআনের দুটি মু'জেযা বা অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআন ব্যতীত ঐশী জ্যোতি লাভ করার আর কোনো মাধ্যম নেই। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যেন স্থায়ীভাবে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে এবং কোনোকালেই যেন মিথ্যা, সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে কেয়ামত পর্যন্ত এই দুটি নিদর্শন দান করেছেন– কুরআনের ভাষাগত নিদর্শন এবং কুরআনের ভাষার

প্রভাব বা কার্যকারিতার নিদর্শন। (অর্থাৎ একটি হলো কুরআনের ভাষার নিদর্শন এবং আরেকটি হলো এই পবিত্র বাণীর প্রভাবের নিদর্শন) যেগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম থেকেই মিথ্যা বা অসার ধর্মগুলো ব্যর্থ হয়ে আসছে। যদি কুরআনের শুধু ভাষাগত নিদর্শন রয়ে যেতো এবং কুরআনের কার্যকারিতার নিদর্শন না থাকতো তবে ঐশী কৃপাধন্য উম্মতে মুহাম্মদীয়ার পবিত্র লক্ষণ ও ঈমানের জ্যোতির ক্ষেত্রে কি-ইবা শ্রেষ্ঠত্ব থাকতো? কেননা নিছক সাধনা ও পাপবর্জন করে চলা নিদর্শনের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না (পবিত্র কুরআনের শিক্ষা যদি প্রকৃত অর্থে আত্মস্থ করা হয় তাহলে এর পবিত্র প্রভাবও সৃষ্টি হয়)।

আবার পবিত্র কুরআন অনুসরণ করলে এই পৃথিবীতেই মুক্তির লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়– এই বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন যা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের ভিত্তি, তা এমন এক গ্রন্থ যার অনুবর্তিতার ফলে এই পৃথিবীতেই মুক্তির লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে যায়। এটি সেই গ্রন্থ যা দুর্বল লোকদেরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ– উভয় দিক থেকেই পরিপূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে দেয় এবং সন্দেহ ও সংশয়ের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দান করে। (ত্রুটিপূর্ণ আত্মা বলতে সেসব মানুষকে বোঝায় যাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। পবিত্র কুরআন কেবল তাদের দুর্বলতাকে দূরই করে না, বরং তাদেরকে উন্নত মানেও উপনীত করে।) বাহ্যিকভাবে (কুরআন এই কাজ) এভাবে করে যে, এর কথা সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সত্যের এমন এক সমাহার যে, পৃথিবীতে যতপ্রকার এমন সন্দেহ-সংশয় রয়েছে যা খোদা পর্যন্ত পৌঁছনোর পথে অন্তরায়, যেগুলোতে নিপতিত হয়ে শত শত ভ্রান্ত দলের সৃষ্টি হচ্ছে এবং শত শত ধরনের ভ্রান্ত ধ্যানধারণা পথভ্রষ্ট মানুষদের মনে বাসা বাঁধছে– এই সবকিছুর খণ্ডন এতে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিদ্যমান। (পবিত্র কুরআন এত সুস্পষ্টভাবে যুক্তিপ্রমাণ ও সত্যসমূহ বর্ণনা করে যে, যত সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেগুলোকে দূর করে। তবে শর্ত হলো, সেগুলো বুঝতে হবে; আর বুঝতে হলে যাকে বোঝানোর জন্য পাঠানো হয়েছে তাঁর বাণী দ্বারা উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।) তিনি (আ.) বলেন, আর যেসব সত্য ও পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষার জ্যোতি বর্তমান যুগের অমানিশা দূর করার জন্য প্রয়োজন সেগুলো সবই এতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। (বর্তমান যুগেও যেসব অমানিশা বিস্তার লাভ করছে, যেমন- ধর্ম-বিমুখতা, অশ্লীলতা, বৃথা কার্যকলাপ কিংবা খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যাওয়া– এ যাবতীয় অমানিশা দূর করার জন্য এবং আলো লাভ করার জন্য পবিত্র কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো, এতে এই সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে)। তিনি (আ.) বলেন, সেগুলো সবই এতে সূর্যের ন্যায় জ্বলজ্বল করছে। (এগুলো কুরআনে সূর্যের মতো দেদীপ্যমান রয়েছে।) আর সকল আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা এর মাঝে নিহিত এবং সকল গূঢ়তত্ত্বের বর্ণনায় এটি পরিপূর্ণ এবং ঐশী জ্ঞানের এমন কোনো সূক্ষ্মদিক বাকি নেই যা ভবিষ্যতে প্রকশিত হতে পারে অথচ এই গ্রন্থে তার উল্লেখ নেই। আর অভ্যন্তরীণভাবে এভাবে এর পূর্ণ অনুসরণ (শর্ত হলো, এ গ্রন্থের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে) আত্মাকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করে দেয় যে, মানুষ অভ্যন্তরীণ সকল পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে মহান আল্লাহ্‌র সাথে একটি বন্ধন রচিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং গ্রহণীয়তার জ্যোতি তার মাঝে বিকশিত হতে আরম্ভ করে আর ঐশী সাহায্য তাকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করে ফেলে যে, যখন সে কোনো বিপদের সময় দোয়া করে তখন পরম দয়া ও স্নেহের সাথে মহাসম্মানিত খোদা এর উত্তর দেন। আর অনেক সময় এমন অবস্থারও অবতারণা হয় যে, সে যদি নিজের সমস্যায় জর্জরিত ও দুঃখের পাহাড় মাথায় নিয়ে হাজার বারও দোয়া করে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ

থেকেও হাজার বারই পরম প্রাঞ্জল, প্রশান্তিদায়ক ও আশিসময় বাক্যে ভালোবাসাসিক্ত উত্তর লাভ করে এবং ঐশী বাণী বারিধারার ন্যায় তার প্রতি বর্ষিত হতে থাকে আর সে নিজ হৃদয়ে খোদাপ্রেম এমন কানায় কানায় পূর্ণ অনুভব করে যেমনটি একটি অতি স্বচ্ছ কাঁচ কোনো অতি উচ্চ মানের আতর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং ভালোবাসা ও আকর্ষণের এমন পবিত্র স্বাদ তাকে দান করা হয় যা তার প্রবৃত্তির কঠিনতর শেকলকে ভেঙে ধুম্রদুষিত গোলক থেকে বের করে অর্থাৎ এ পৃথিবীর এই নোংরা বাতাস বা দূষিত হাওয়া ও ধোঁয়া থেকে বের করে প্রকৃত প্রেমাস্পদের সুশীতল ও আরামদায়ক বাতাস বা পরিবেশে তাকে সদাসর্বদা সতেজ জীবন দান করতে থাকে।

পবিত্র কুরআন অকাট্য ও অবিসংবাদিত গ্রন্থ- এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন: পবিত্র কুরআন যা আল্লাহ্‌র কিতাব, এর তুলনায় অন্য কোনো অকাট্য ও সুনিশ্চিত ঐশী গ্রন্থ আমাদের নিকট নেই, এটি খোদার বাণী, এটি সব ধরনের সন্দেহ এবং অনুমানের দুষণ হতে মুক্ত।

পবিত্র কুরআন বিশ্বের সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এসেছে- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

খোদা তা'লা প্রথমে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কর্মপন্থা তথা সংবিধান প্রেরণ করেন। এরপর তিনি ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি যেমন একক সত্তা, সেভাবে সব জাতিও যেন এক জাতিতে পরিণত হয়। তখন তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কুরআনকে প্রেরণ করেন এবং এই সংবাদ দেন, এমন এক যুগ আসন্ন যখন খোদা সকল জাতিকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করবেন এবং সকল দেশকে এক দেশে রূপান্তরিত করবেন আর সকল ভাষাকে এক ভাষা বানিয়ে দিবেন। লোকেরা প্রশ্ন তোলে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত কেন এল? এর কারণ হলো, সে সময় পর্যন্ত তাদের বুদ্ধি ও বোধশক্তি এবং উপায়-উপকরণ ততটাই ছিল অর্থাৎ সেযুগের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ববর্তী যুগে পৃথক পৃথক শিক্ষা পাঠিয়েছেন। এখন এমন এক যুগ এসে গেছে যখন সকল জাতি একীভূত হতে পারে। তাই পরিপূর্ণ শরীয়ত বা জীবনবিধানরূপে পবিত্র কুরআন আমাদের জন্য আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন। সকল দেশকে তিনি এক দেশে পরিণত করবেন আর সকল ভাষাকে এক ভাষায় পরিণত করবেন। বর্তমানে বিশ্বপল্লি বা 'গ্লোবাল ভিলেজ' একটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ বিশ্ব এখন এক হয়ে গিয়েছে এবং বিশ্ব এখন এক শহরের রূপ পরিগ্রহ করেছে। পবিত্র কুরআনই সেই বাণী যা বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও আর যে দেশেই মুসলমানরা বসবাস করুক না কেন, সেখানে এই পবিত্র কুরআন আরবী ভাষাতেই পাঠ করে এবং একইভাবে পাঁচবেলার নামাযেও এর ব্যবহার করা হয়।

পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ ও নবীদের প্রতি পবিত্র কুরআনের অনুগ্রহ রয়েছে- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী সব ঐশী কিতাব এবং পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে, কেননা তাদের যে শিক্ষাগুলো কল্পকাহিনী আকারে ছিল সেগুলোকে জ্ঞানের রূপ দিয়েছে। আমি সত্য সত্য বলছি, কোনো ব্যক্তি ঐসব কিচ্ছা-কাহিনী দ্বারা মুক্তি পেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র কুরআন না পড়বে কেননা এটি পবিত্র কুরআনেরই মহিমা যে, إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ। কুরআন হল মুহাইমেন, নূর, শেফা এবং রহমত। যারা পবিত্র কুরআন পাঠ করে এবং একে কল্পকাহিনী মনে করে, তারা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন পড়েই নি বরং এর অবমাননা করেছে। আমাদের বিরোধীরা বিরোধিতায়

এতটা ক্ষুরধার হয়েছে কেবল এ কারণে যে, আমরা পবিত্র কুরআনকে খোদা তা'লার উক্তি অনুসারে, সাক্ষাৎ নূর, হিকমত এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণ করতে চাই আর তারা পবিত্র কুরআনকে একটি সাধারণ গল্পকাহিনীর ঊর্ধ্বে গুরুত্ব দিতে চায় না– এটি আমরা সহ্য করতে পারি না। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন একটি জীবিত এবং আলোকিত কিতাব। তাই আমরা তাদের বিরোধিতার পরোয়া কেন করব?

পবিত্র কুরআনের মর্যাদার বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের মর্যাদার বড় বড় প্রমাণাদির মাঝে এটিও একটি যে, এর মাঝে মহান জ্ঞান বিদ্যমান যা তওরাত এবং ইঞ্জিলের মাঝে অন্বেষণ করাই বৃথা। এসব জ্ঞান সেখানে পাওয়া যাবে না। আর একজন ছোট বা বড় মর্যাদার ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী এর থেকে অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের জ্ঞান থেকে অংশ লাভ করতে পারে। অতএব, এর অর্থ এবং বিষয়বস্তু (বা উদ্দেশ্যের) প্রতি সবার গভীর অভিনিবেশ করার অভ্যাস সৃষ্টি করা প্রয়োজন; যেন খোদা তা'লার বাণীর সৌন্দর্যের বিষয়ে আমরা অবগত হই।

পবিত্র কুরআনের আদেশ-নিষেধের বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আদেশ-নিষেধ এবং ঐশী শিক্ষার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে আর বিভিন্ন বিধিবিধানের কয়েক'শ শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করা হয়েছে। এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, তিলাওয়াত করার সময় সেগুলো অন্বেষণ করা আবশ্যক এরপর সেগুলোকে জীবনের অংশ বানানো উচিত, তখনই আমরা খোদা তা'লার বাণী থেকে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবো।

পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন, স্মরণ থাকে যে! পবিত্র কুরআন সেই সুনিশ্চিত ঐশীবাণী যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে একটি বিন্দুবিসর্গও প্রবেশ করে নি এবং এটি নিজ বাক্যাবলী আর অর্থের সাথে খোদা তা'লারই বাণী এবং মুসলমানদের কোনো ফির্কার এটি স্বীকার করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এর একেকটি আয়াত উন্নত পর্যায়ের ক্রমবিন্যাস সমৃদ্ধ এবং তা 'ওহীয়ে মাতলু' অর্থাৎ এমন ওহী যা বার বার পঠনীয়, যার প্রত্যেকটি অক্ষর গণনাকৃত। এটি নিদর্শন হওয়ার নিরিখে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে সুরক্ষিত। এর বিন্যাস এমন যে, এটিও একটি মু'জিযা অর্থাৎ এটি পরিবর্তন হতেই পরে না। (কীভাবে বলা যেতে পারে যে, পবিত্র কুরআনে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে? যদি এমনটি করা হয় তাহলে এটি তো প্রকৃত অবস্থায় থাকবে না আর মূল বিষয়বস্তুও বজায় থাকতে পারে না।)

এরপর পবিত্র কুরআনের শব্দের গভীরতা এবং বিষয়বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও গুঢ় রহস্য এবং সত্য প্রজ্ঞা যুগের আবশ্যকতা অনুযায়ী প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা যে যুগে আছি আর দাজ্জালী শক্তির বিপরীতে যে ফুরকানী (তথা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী) তত্ত্বজ্ঞান আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে, সেই প্রয়োজনীয়তা তাদের ছিল না যারা দাজ্জালী ফির্কার যুগ পায় নি।

সুতরাং সেই বিষয়সমূহ তাদের নিকট লুক্কায়িত ছিল আর আমাদের কাছে উন্মোচন করা হয়েছে। সময়-সুযোগ, স্থান এবং যুগের নিরিখে তা থেকে বিভিন্ন বিষয় উন্মুক্ত হতে থাকে। সেই যুগে তা প্রয়োজন ছিল না। সেই যুগে যেসব তফসীর লিখা হয়েছে তা সেই যুগের অবস্থার নিরিখে ছিল আর আজ যা হচ্ছে তা বর্তমান যুগের অবস্থানুযায়ী হচ্ছে। এবং এই সবকিছু পবিত্র কুরআন থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়, এটি থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একই

শব্দাবলীতে মনোনিবেশ করলে তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়। কাজেই, এমন কিতাবই কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে পারে অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে শব্দাবলী থেকে মর্ম উন্মোচিত হতে থাকবে।

পুনরায় পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য বর্ণনা করে তিনি (আ.) বলেন, **পবিত্র কুরআন অভ্যন্তরীণ তত্ত্বকথা, যার অস্তিত্ব সহীহ্ হাদীস এবং স্পষ্ট আয়াত থেকে প্রমাণিত; তা কখনো অযথা প্রকাশ পায় না বরং পবিত্র কুরআনের এই মু'জিযা এমন সময়ে স্বীয় ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করে যখন এই ঐশী মু'জিযা প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়।** (তত্ত্বজ্ঞানও অর্জিত হয় এবং সহীহ্ হাদীসসমূহ থেকেও তা বের করা যায় এবং স্পষ্ট আয়াতও এর প্রমাণ বহণ করে)।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **পবিত্র কুরআনে সবকিছু উল্লেখ আছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছুই লাভ হতে পারে না। শর্ত হলো অন্তর্দৃষ্টি। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নকারী যখন এক বছর থেকে উন্নতি করে পরবর্তী বছরে পদার্পণ করে তখন সে তার বিগত বছরকে এমন মনে করে যেন সে মক্তবের এক শিশু ছিল। কেননা এটি খোদা তা'লার বাণী আর এর উন্নতিও এভাবেই হয়।** (এমন নয় যে, আমরা একবার পাঠ করলাম আর এর সকল জ্ঞান অর্জিত হয়ে গেল বরং এক বছর মনোনিবেশ করার পর যখন পরবর্তী বছরে পা রেখে দ্বিতীয়বার মনোনিবেশ শুরু করে তখন বুঝতে পারে পূর্বে যা আমি পাঠ করে এসেছি তা তো কিছুই ছিল না সেগুলো তো শিশুসুলভ কথাবার্তা ছিল। সেগুলো প্রাথমিক বিষয়বস্তু ছিল যা আমি বুঝে ছিলাম। মাত্র এখন আমি প্রকৃত পর্যায়ে পৌঁছেছি আর এভাবে প্রতি বছর উন্নতি করতে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, যারা পবিত্র কুরআনকে **'যুল ওজুহ্'** (অর্থাৎ বহুমুখী অর্থ রাখে) বলে আমি তাদের পছন্দ করি না। তারা পবিত্র কুরআনের সম্মান করে নাই। পবিত্র কুরআনকে **'যুল মাআরেফ'** বলা উচিত, তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ বলা উচিত। অগণিত তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে। এক একটি স্থান থেকে কয়েকটি তত্ত্ব উৎসারিত হয়। একটি গূঢ়কথা অপরটির বিপরীত হয় না, তা খণ্ডনকারী হয় না, সেটিকে প্রত্যাখ্যানকারী হয় না। তবে বদমেজাজী, বিদ্বেষপরায়ণ এবং রাগী স্বভাবের লোকের সাথে পবিত্র কুরআনের কোনো সম্পর্ক নাই আর এমন ব্যক্তিদের নিকট পবিত্র কুরআনের রহস্যাবলী উন্মোচিত হয় না। এটি গভীরভাবে অভিনিবেশকারীদের কাছে, পবিত্র লোক, আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আশ্রয়গ্রহণকারী লোক, তাঁর কাছে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রার্থনাকারীদের নিকটই এর প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে সকল সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্বের সমাহার এবং সকল যুগের বিদা'তের মোকাবিলা করে থাকে। এই অধমের বক্ষ এর চাক্ষুস প্রজ্ঞা ও আশিসে পরিপূর্ণ। {বর্তমান যুগে, আমাদের যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ই এর সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান আমাদের নিকট উন্মোচন করেছেন এবং তাঁর (আ.) রচনাবলীর মাধ্যমে এর অধিক ব্যাখ্যা সামনে আসে। এগুলো যদি বুঝে পাঠ করা হয় তবে পবিত্র কুরআনের গুণাবলীর, শিক্ষার, তত্ত্বের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পায়।} তিনি (আ.) বলেন, **নিঃসন্দেহে আমাদের মঙ্গল, জ্ঞানের উন্নতি এবং আমাদের স্থায়ী বিজয়সমূহের জন্য আমাদেরকে কুরআন দেয়া হয়েছে। এর নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যাবলী অনন্ত যা আত্মশুদ্ধি এবং আলোকিত চিন্তাধারার মাধ্যমে উন্মোচিত হয়।** তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা যখনই কোনো জাতির সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়েছেন, সেই জাতির ওপর আমরা কুরআনের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেছি। এটি যেভাবে একজন নিরক্ষর গ্রাম্য ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করে তেমনিভাবে একজন যুক্তিবাদী দার্শনিককে প্রশান্তি দান করে। তা কেবল একটি গোষ্ঠির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে আর অন্য

গোষ্ঠি এ থেকে বঞ্চিত থাকবে– এমন নয়। নিঃসন্দেহে এতে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক যুগ এবং প্রত্যেক প্রকৃতির মানুষের জন্য চিকিৎসা নিহিত রয়েছে। যেসব মানুষ সৃষ্টিগত দিক থেকে উল্টো আর অপূর্ণ স্বভাবের নয় তারা পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। অর্থাৎ যারা নিজের সৃষ্টির (উদ্দেশ্য) বুঝে না এমন নির্বোধ লোক অথবা যারা উন্নতির পরিবর্তে অবনতির দিকে ধাবিত হয় এমন লোক, আধ্যাত্মিকভাবে কম বুদ্ধি রাখে এমন মানুষকে কুরআন কোনো কল্যাণ দান করে না। কিন্তু তারা যদি এরূপ না হয় তাহলে তাদের জন্য (কুরআনের) মাহাত্ম্যের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক এবং তারা ঈমান এনে থাকে আর এর জ্যোতি থেকে তারা উপকৃত হয়।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন, সমস্ত সত্য পথের দিশার মধ্য হতে শুধু কুরআনের হিদায়াতই শুদ্ধতার পরম মার্গে অধিষ্ঠিত এবং মানবীয় মিশ্রণ থেকে মুক্ত।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আমাদের বিশ্বাস হলো, বিজ্ঞান যত বেশি উন্নতি করবে এবং ব্যবহারিক রূপ ধারণ করবে পৃথিবীর বুকে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বও তত বেশি প্রতিষ্ঠা পাবে। কাজেই আমাদের যারা জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষণা করে তাদেরও উচিত পবিত্র কুরআন থেকে সাহায্য নেয়া আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেকেই এমন রয়েছে যারা নিয়ে থাকে। অনেকেই প্রবন্ধ লিখেও থাকে। এতে লুক্কায়িত জ্ঞান উন্মোচন করে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা উচিত। ডক্টর আব্দুস সালাম সাহেবও সর্বদা এই নীতির ওপরই কাজ করেছেন।

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন সীমাহীন তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং প্রত্যেক যুগের প্রকৃত চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করে থাকে**। তিনি (আ.) বলেন, **যে তত্ত্ব, সত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রজ্ঞা এবং প্রাঞ্জলতা পবিত্র কুরআনে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীনরূপে বিদ্যমান এই মহান মর্যাদা অন্য কোনো কিতাব তথা ধর্মগ্রন্থের নেই**। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনকে কল্যাণ বা খায়ের আখ্যা দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا {অর্থাৎ আর যাকে (এই কুরআনের) প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাকে অনেক অনেক কল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে। (সূরা আল্ বাকারা: ২৭০)} অতএব পবিত্র কুরআন তত্ত্ব ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পদের ভাণ্ডার। আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের তত্ত্বভাণ্ডার ও এতে বিধৃত জ্ঞানের নামও সম্পদ রেখেছেন। জাগতিক কল্যাণও এরই সাথে এসে থাকে।

পুনরায় তিনি (আ.) একটি সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না সে অবশেষে মারা পড়বে আর অবশ্যই মারা পড়বে। আল্লাহ্ যে কারণে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শেষ কিতাব পবিত্র কুরআন যে কারণে অবতীর্ণ করেছেন তার কারণ হলো, বিশ্ববাসী যেন এই বিষে ধ্বংস না হয়; বরং যেন এর বিভিন্ন (ক্ষতিকর) প্রভাব সম্পর্কে অবগত হয়ে রক্ষা পায়। কাজেই প্রত্যেক আহমদীর এটিও কাজ যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে নিজের জীবনকে গড়ার চেষ্টা করার পাশাপাশি জগদ্বাসীকেও এই শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ধ্বংসের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) খাতামুন্ নবীঈন এবং পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব। এখন আর কোনো কলেমা অথবা আর কোনো নামায থাকতে পারে না। মহানবী (সা.) যা কিছু বলেছেন বা করে দেখিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা বাদ দিয়ে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যে এটিকে পরিত্যাগ করবে সে

জাহান্নামে যাবে। এটি হলো আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস। যিনি এরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন তিনি কীভাবে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করার অপরাধে অপরাধী হতে পারেন? হায়! সাধারণ মুসলমানরাও যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারত এবং দুষ্কৃতকারী আলেম সমাজের খপ্পর থেকে মুক্ত হয়ে যুগ ইমামকে চিনতে পারত!

তিনি (আ.) আরো বলেন, সত্যনীতি শনাক্তকরণের নিশ্চিত, পরিপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম এবং সেসব বিশ্বাস যার নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর আমাদের পরিত্রাণ নিহিত তা কেবল পবিত্র কুরআন। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমরাই এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণ করব। অর্থাৎ কুরআনের অর্থে যখন ভুলভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করবে তখন সংশোধনের জন্য আমাদের প্রত্যাদিষ্ট আসবে আর তাঁর এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা যুগের প্রত্যাদিষ্ট ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে পাঠিয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার এই উক্তিটি নিয়ে একটু চিন্তা করো এবং দেখো! যুগের অবস্থা কী? বিধর্মীরা তোমাদেরকে ধরে ধরে ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, দাজ্জাল ষড়যন্ত্র করছে কিন্তু তোমরা আগত মসীহ্ ও মাহদীকে দাজ্জাল আখ্যা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে মুসলিম বিশ্বকে দূরে রাখার চেষ্টা করছ। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা আমার সম্পর্কে চিন্তা করো না এবং ভেবো না যে, আমি এসে গেছি আর এই এই দাবি করেছি। যুগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করো। শতাব্দীর সূচনা, বাহিরের আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখে নিজেই চিন্তা ও প্রণিধান করো যে, এ যুগে কি দাজ্জাল আসার প্রয়োজন নাকি মাহদী ও মসীহ্‌র আগমন প্রয়োজন? তিনি (আ.) বলেন, বিদ্বেষ একটি ভয়াবহ রোগ। বিদ্বেষীরা কখনো কোনো রসূলকে মান্য করে নি। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিবেক দিন এবং তারা যেন এটি বুঝেন।

পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুটি ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। একটি যৌক্তিক দিক এবং অপরটি এলহামী সাক্ষ্য। এই দুটি বিষয় পবিত্র কুরআনে দুটি সুন্দর-স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহমান যা একে অপরের সমান্তরাল চলে এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে, অর্থাৎ সমানতালে প্রবাহিত হচ্ছে, একটি অপরটির সমান্তরালে চলছে আর উভয়েই একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য ছিল পশুকে মানুষ বানানো এবং মানুষকে চরিত্রবান মানুষ বানানো আর চরিত্রবান মানুষকে খোদাপ্রেমিক মানুষে পরিণত করা। আরবদের মাঝে আমরা এই লক্ষ্য পূর্ণ হতে এবং পরম মাত্রায় পূর্ণ হতে দেখি। আমাকে একজন ইহুদী নিজে একথা বলেছে যে, (কয়েক বছর পূর্বের কথা এটি) আমি মুসলমান নই কিন্তু মহানবী (সা.)-কে আমি অবশ্যই রসূল হিসাবে মান্য করি। এর কারণ হলো, সে যুগে আরবের মরুবাসীদের যে অবস্থা ছিল আর যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাদের মাঝে সাধিত হয়েছে তা একজন রসূলের পক্ষেই সম্ভব, কোনো সাধারণ মানুষ এটি করতে পারে না। তিনিই করতে পারতেন যিনি ঐশী সমর্থনপুষ্ট। তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন দেখে আমি বিস্মিত হই, সেই নিরক্ষর রসূল কেবল কিতাব ও প্রজ্ঞাই শেখান নি বরং আত্মশুদ্ধি লাভের উপায় শিখিয়েছেন, এমনকি **আইয়্যাদাহুম বিরূহিম মিনহু,** অর্থাৎ তিনি তাদেরকে স্বীয় নির্দেশে সাহায্য করে এ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। দেখো এবং গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখো! কুরআন সকল শ্রেণির সন্ধানীকে তার লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং সততা ও সত্যের পিয়াসীকে পরিতৃপ্ত করে। তিনি (আ.) বলেন, ঐশী এলহাম দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য এসে

থাকলেও পবিত্র কুরআন সেই সুমহান বিশ্বাসের ভিত রচনা করেছে, যার কোনো তুলনাই হয় না।

জামা'তের সদস্যদের কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, {বয়আতের শর্তাবলীর মাঝেও তিনি (আ.) এটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, বয়আতের ষষ্ঠ শর্ত হলো,} **সামাজিক কদাচার পরিহার করবে, কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলোআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।** কিন্তু অসাধু আলেম সম্প্রদায় যারা কাণ্ডজ্ঞানহীন, তাদের দৃষ্টিতে এরপরও আমরা নাকি পবিত্র কুরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধনকারী। তিনি (আ.) বলেন, ঐশী কালাম কুরআনের কোনো আয়াতকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা আর বাক্য বানানোর অধিকার রাখি না। (পবিত্র কুরআনে) আমরা কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারি না, এতে কম বা বেশি করতে পারি না আর কোনো ধরণের বাক্য বানানোরও আমাদের অনুমতি নেই। এটি হয়ত করা যেতে পারতো যদি মহানবী (সা.) এমনটি করতেন। হ্যা! মহানবী (সা.) এমনটি করেছেন তা যদি প্রমাণ হয় তাহলে ঠিক আছে, আমাদেরকে দেখাও। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এমনটি প্রমানিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কুরআনের ধারাবিন্যাসকে কোনোভাবে নষ্ট করতে পারি না আর এতে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো বাক্যও যুক্ত করতে পারি না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আমরা দোষী এবং শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবো। তিনি (আ.) বলেন, এমনটি হওয়া যদি সম্ভবপরই না হয় তাহলে আমাদেরকে অপরাধী বলছো কেন? কিন্তু আমরা যদি এমনটি করে থাকি তাহলে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হবো। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং পবিত্র কুরআনে সকল প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আপত্তি খণ্ডন করে ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা যদি এমনটি করে থাকি তবে (আমরা) অপরাধী এবং আল্লাহ্‌র তা'লার দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবো। আমাদের বিরুদ্ধে যারা আপত্তি আরোপ করে তারা নিজেদেরকে খোদা তা'লার চেয়েও বড় মনে করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন না কিন্তু এসব লোক যারা বর্তমানে এ বিষয়ে হট্টোগোল করে থাকে তারা আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে চায়। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের অনিষ্ট থেকে প্রত্যেক আহমদীকে রক্ষা করুন এবং তাদের অনিষ্টে তাদেরকেই কবলিত করুন। সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন অনুধাবন করার এবং এর অনুশাসন মেনে চলার তৌফিক দান করুন।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য এবং পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন। বুরকিনা ফাসোর আহমদীদের জন্য এবং দেশের সার্বিক অবস্থার (উন্নতির) জন্য দোয়া করুন। বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও সুরক্ষা করুন। আজও সেখানে মৌলভীদের গণ্ডগোল করার কথা ছিল। পাকিস্তান, পৃথিবীর সবগুলো দেশ যেখানে আহমদী রয়েছে তাদের জন্য দোয়া করুন। যেমনটি আমি বলেছি, রমজান মাসও আগত প্রায়, এতে পবিত্র কুরআন পড়ার ও অনুধাবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পাশাপাশি দোয়া করার প্রতিও বিশেষভাবে মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন এবং রমজানের কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য দিন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)